দৈনিক ইনকিলাব 12
তারিখ 17 APR 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

শিক্ষা তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
102

মাদ্রাসা শিক্ষার অতীত ও বর্তমান

মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

মাদ্রাসা শিক্ষার অতীত ঃ

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। কেননা, শিক্ষা সম্পর্কিত পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উক্তিতে তৌহিদে বিশ্বাসী মুসলমানগণ অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশ বিজয়ের সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোর মশালও নিয়ে আসছিলেন। তাইতো আমরা দেখতে পাই মধ্যযুগে গোটা মুসলিম বিশ্বে একটি মাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ছিল আর তা ছিল কুরআন-হাদিস ভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষা।

প্রাথমিক যুগে মাদ্রাসা শিক্ষ ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে (৭১৭-২০) উমাইয়া খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের শাসনামলে মসজিদ ছাড়াও প্রচলিত স্বতন্ত্র মাদ্রাসা গৃহ নির্মাণ করে ব্যাপক শিক্ষার প্রসারতা ঘটে। এ সময় সরকারী কোষাগার হতে মাদ্রাসার শিক্ষক ও মসজিদের ইমামগণকে বেতন দেয়া হত। পরবর্তীতে আব্বাসীয় শাসনামলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারতাকল্পে বাগদাদে নেজামিয়া, মুস্তানসেরিয়াসহ মিশরে আল আজহার ও স্পেনে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। আর এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হন ইবনে খালদুন ও আল তাবারীর ন্যায় ঐতিহাসিক, রাজী ও ইবনে সিনার ন্যায় চিকিৎসাবিদ, ইমাম আল গাজ্জালী ও ইবনে রুশদের ন্যায় দার্শনিক, ওমর খইয়াম ও খাল খাওয়ারিজমির ন্যায় গণিত শাস্ত্রবিদ, আলকেমির ন্যায় রসায়ন শাস্ত্রবিদ, যারা আজও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে চির স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ

অন্যান্য মুসলিম বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশসহ গোটা উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে মসজিদ, মাদ্রাসা ও মক্তবই ছিল শিক্ষা ও সাহিত্য কর্মের প্রধান কেন্দ্র। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার উইল, ওয়াকফ, হেবা মানত ইত্যাদির মাধ্যমে মেটান হত। এছাড়াও মুসলিম শাসকগণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বহু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। এ ধরনের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ সোনারগাঁ ও গৌড়ের ফিরোজাবাদসহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে আজও পরিলক্ষিত হয়।

এভাবে সুদীর্ঘ হাজার বছর ধরে লালিত মুসলিম শিক্ষা সাহিত্য ও কৃষ্টি ১৭৫৭ সালে পলাশীর বিপর্যয়ের পর হতে বিলুপ্ত হতে থাকে। কারণ, বৃটিশ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পরে ওয়াকফ ও হেবা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এদেশের মক্তব ও মাদ্রাসাগুলি বিলুপ্ত অথবা ধর্ম নিরপেক্ষ স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়। এতে মুসলমানদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়ায় পরিশেষে ১৭৮১ খৃঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গর্ভনর ওয়ারেন হিস্টিংস কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা ঃ

১৯২৮ খৃঃ "সেন্ট্রাল বোর্ড অব মাদ্রাসা একজামিনেশন" নামে ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সহকারী পরিচালক (বিশেষ শিক্ষা)-কে পদাধিকার বলে উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে পদাধিকার বলে রেজিষ্টার করে আরও ছয়জন সদস্য নিয়ে এই বোর্ড গঠিত হয়। এই বোর্ডের প্রধান দায়িত্ব ছিল কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাস অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলিকে মঞ্জুরী প্রদান, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, পরীক্ষা পরিচালনা ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সনদ পৃদান। বলা বাহুল্য, আজকের স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এরই প্রতিচ্ছবি।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে সংশ্লিষ্ট কিতাবাদি, রেকর্ডপত্র ও আবাসপত্রসহ কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। এ সময় মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতিকল্পে সরকার কতিপয় কমিশন নিয়োগ করেন। এসব কমিশনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

১। মাদ্রাসা সিলেবাস কমিটি বা সৈয়দ মোয়াজ্জেমুদ্দিন হোসেন কমিটি ১৯৪৬।
২। মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি বা আশ্রাফুদ্দিন চৌধুরী কমিটি ১৯৫৬।
৩। শিক্ষা সংস্কার কমিশন বা আতাউর রহমান কমিশন ১৯৫৭।
৪। জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৫৮-৬১।
৫। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা এস এম হোসেন কমিশন ১৯৬৩-৬৪।

উল্লেখিত কমিশনগুলি মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন তথা আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ পেশ করেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিল মাদ্রাসা বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসিতকরণসহ একটি পূর্ণাংগ ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার মাদ্রাসা বোর্ডকে স্বায়ত্তশাস্তি করেছেন সত্য কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন তাতে পুরাপুরি ঘটেনি। অনুরূপভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার অদূরে গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্য কিন্তু ইহাতেও মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় নাই। কারণ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য কোন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা রাখেনি। অনুরূপভাবে এফিলিয়েশনের ক্ষমতাও দেয়া হয়নি, যার ফলে দাখিল ও আলিমের শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার সাথে এসএসসি ও এইচএসসি'র সমমান পেলেও ফাজিল ও কামিলের শিক্ষার্থীরা ডিগ্রী ও মাস্টার ডিগ্রীর সমমান পাচ্ছে না। এ হতাশাগ্রস্ত মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য যেটা প্রয়োজন তা হলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে এফিলেয়েশন ক্ষমতা দিয়ে ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাগুলি তার আওতায় নেয়া এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ফ্যাকালটি খোলার ব্যবস্থা করা। অনুরূপভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে কারিকুলাম ও টেকস্টবুক প্রকাশনার ক্ষমতা প্রদানসহ সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

মাদ্রাসার স্তর বিন্যাস ঃ

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মঞ্জুরী প্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলি ৫টি স্তরে বিন্যাস্ত ঃ

১। এবতেদায়ী (প্রাথমিক স্তর) ৫ বছর।
২। দখিল (মাধ্যমিক) ৫ বছর।
৩। আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক ২ বছর।
৪। ফাজিল (স্নাতক) ২ বছর।
৫। কমিল (এমএ) ২ বছর।

মঞ্জুরীপ্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ঃ

সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ২৫শে মে '৮৮ পর্যন্ত মঞ্জুরীপ্রাপ্ত কামিল মাদ্রাসা ৯০টি, ফাজিল মাদ্রাসা ৬৫৮টি, আলিম ৬৯০টি এবং দাখিল ৩.৯৫৪টি মোট ৫,৩৯২টি মাদ্রাসার মধ্যে অনধিক পাঁচ হাজার মাদ্রাসা নিয়মিত অনুদানভুক্ত। এছাড়া ১৪,১৬৯টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা আছে যাহা নিয়মিত অনুদানভুক্ত নয়। এ সমস্ত মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সংখ্যা (এবতেদায়ী হতে কামিল পর্যন্ত) ৩১,১৮,০০০ এবং শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ১,৫০,০০০।

উপরোক্ত মঞ্জুরীকৃত মাদ্রাসাগুলি মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের জন্য আনুপাতিক হারে বেশী বলা চলে না। এ মাদ্রাসাগুলি যদি দেশব্যাপী সুষম নির্ধারিত নীতির মাঝে প্রতিষ্ঠিত হত তা হলে দেশের চাহিদা মাফিক মাদ্রাসার অভাব পূরণ করতে পারতো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, স্থান বিশেষে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অপ্রয়োজনীয় বেশ কিছু মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। অপর দিকে একান্তভাবে যেখানে মাদ্রাসা প্রয়োজন সেখানে কোন তরফ হতেই মাদ্রাসা গড়ার কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। বিষয়টি সরকারী দৃষ্টিতে গভীরভাবে পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে।

মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় ঃ

উল্লেখিত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে তথা উপমহাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলিম আগমন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সব সময়ই চালু ছিল। তবে বৃটিশ শাসনামলে ফারসীর পবিবর্তে ইংরেজী রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণা করায় এবং ইসলামী আইনের পরিবর্তে পাশ্চাত্য আইন প্রবর্তন করার ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব কমে যায়। এ সময় দ্বিধাবিভক্ত বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের একশ্রেণী মাদ্রাসা শিক্ষিত মহলে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের অনুপ্রেরণা দেয়। ফলে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে চালু হয়। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে ফাজিল শ্রেণীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে প্রবেশিকা ইংরেজী সিলেকশন পড়ান হত। কিন্তু ফাজিল পাস ছাত্রদেরকে প্রবেশিকা পাসের সমমান দেওয়া হত না।

দেশ বিভাগের পরে ১৯৬৩ইং সন হতে ইংরেজী ও বাংলাসহ ফাজিল পাস করলে মেট্রিক পাশের সমমান দেয়া হত। বাংলাদেশ হওয়ার পরে ১৯৭৮ সাল হতে আলিম পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজীসহ উত্তীর্ণদেরকে এসএসসি'র মান দেওয়া হত। অতঃপর ১৯৮৫ সন থেকে আন্তঃবোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ বলে দাখিলকে এসএসসি এবং আলিমকে ১৯৮৭ সন থেকে এইচএসসি'র সমমান নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ফাজিল ও কামিলকে কোন স্বীকৃত ডিগ্রীর সমামান এ পর্যন্ত দেয়া হয় নাই। যদিও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড তাদের পরীক্ষা নিচ্ছে এবং ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রীর সমমান বলছে। তথাপি এটা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তথা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত নয়। ফাজিল ও কামিলকে জাতীয়ভাবে ডিগ্রী ও মাস্টার ডিগ্রীর মান দিতে হলে অচিরেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অথবা যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এফিলিয়েশনের ব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজন।